Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

IOM
Islamic Online Madrasah

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

নামাজের গুরুত্ব ও ফজিলত

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: জোবায়ের হাসান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

ইসরাত জাহান

রোলঃ 228021170

২০ মে, ২০২৫ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

IOM
Islamic Online Madrasah

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

নামাজের গুরুত্ব ও ফজিলত

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: জোবায়ের হাসান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

ইসরাত জাহান

রোলঃ 228021170

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, " নামাজের গুরুত্ব ও ফজিলত " বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে ইসরাত জাহান, আইডিঃ 228021170 বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: জোবায়ের হাসান
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

এক্সটারনালঃ

মাও: জিল্লুর রহমান
তাজবীদ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, " নামাজের গুরুত্ব ও ফজিলত " শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মুফতি: জোবায়ের হাসান উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি আরও ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব মৌলিক রচনা। আমার জানা মতে ইতিপূর্বে আর কোন ব্যক্তি এই শিরোনামে কোন গবেষণাপত্র রচনা করেননি।

Isr彩at Jahan

(স্বাক্ষর)

তারিখঃ

২০ মে, ২০২৫ ইং

ইসরাত জাহান

আইডিঃ 228021170

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

সূচিপত্র

ভুমিকা:: 5

গুরুত্ব:: 5

শেষ কথা..19

নামাজ না পড়ার কঠিন পরিণতি..20

নামাজের গুরুত্ব...21

বেনামাজির শাস্তি 22

নামাজে অলসতায় ১৫ শাস্তি...23

ফরজ নামাজ ইচ্ছাকৃতভাবে ছেড়ে দিলে যে গুনাহ..26

নামাজ না পড়ার ক্ষতি: 27

যে কারণে নামাজ আল্লাহর কাছে প্রিয় আমল..28

ফজর ও ইশার নামাজের ফজিলত 31

নামাযের খুশূ হাসিল হবে যেভাবে...33

দুআর মর্মার্থ...36

ঘর থেকে বের হওয়ার আরেকটি দুআ..38

নামাযের খুশূ বিষয়ে কয়েকটি হাদীস...40

প্রথম হাদীস..41

দ্বিতীয় হাদীস 45

তৃতীয় হাদীস...47

নামাযে খুশূ হাসিলের সহায়ক তিনটি বিষয়...49

মসজিদ থেকে বের হওয়ার তরীকা...51

তথ্যসূত্র 54

ভুমিকা::

প্রতিটি মুসলমানের জন্য অত্যাবশ্যকীয় ইবাদতসমুহের মধ্য অন্যতম হচ্ছে স্বলাত। এই স্বলাত এমনই এক মহান ইবাদত যার দ্বারা জীবনের সর্বাজ্ঞিন সফলতা লাভ করা যায় । তাই স্বলাত সম্পর্কিত এ আলোচনা কয়েকটি ভাবে তুলে ধরছি।

স্বলাত আরবী শব্দ صلوة (সালাত) আর এই صلوة শব্দটি এসেছে صلي থেকে ।।صلوة শব্দটি এক বচন। এর বহুবচন صلوات . সে মতে
সালাতের শাব্দিক অর্থ হবে تحويك الصلو ين বা পাজড় নড়াচড়া করা।যেহেতু, স্বলাতের মধ্য পাজড় নড়া চড়া হয় তাই স্বালাতকে صلوة) স্বলাত বলে।

গুরুত্ব::

মানুষের সহজাত প্রবৃত্তি হচ্ছে নিজেকে তার প্রভুর কাছে সমর্পণ করা। আর সালাত হচ্ছে নিজেকে আল্লাহর কাছে শারীরিক ও মানসিকভাবে সপে দেওয়ার সবচেয়ে সুন্দর মাধ্যম।

আল্লাহ তায়ালা মানবজাতি সৃষ্টি করেছেন শুধুমাত্র তাঁরই ইবাদাত করার জন্য। তাই সালাতের মাধ্যমে যেমন আল্লাহকে খুশি করা যায়, ঠিক তেমনি নিজেও মানসিক প্রশান্তি লাভ করতে পারে।

ইসলামের পাঁচটি স্তম্ভের দ্বিতীয়টি হচ্ছে সালাত, পবিত্র কোরান ও হাদিস গ্রন্থে বহু জায়গায় সালাত কায়েম করার তাগিদ ও গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেন, নিশ্চয়ই সালাত নির্ধারিত সময়ে আদায় করা মু'মিনদের উপর ফরয।

(সুরাহ আন-নিসা, ১০৩)

আল্লাহ সালাতকে ফরয করে দিয়েছেন বিধায় কোনো অবস্থাতেই বিনা ওযরে (ইচ্ছা করে) সালাত ছাড়া যাবে না। (ইসলামিক পরিভাষায় 'ফরয' মানে হচ্ছে অবশ্য করণীয়)।

আল্লাহ(সুব.) আরো বলেন, "তোমরা আল্লাহ অভিমুখী হও এবং তাকে ভয় কর আর সালাত প্রতিষ্ঠা কর, এবং মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না। "(সুরাহ আর-রুম, ৩১)

সালাতের মাধ্যমে বান্দা তার প্রভুর সঙ্গে সরাসরি কথা বলে, তাই সালাত আল্লাহর আনুগত্য লাভের জন্য একটি সুন্দর ইবাদাত। একাগ্র মনে সালাত আদায়কারী নিজের ও সমাজের কল্যান ব্যতিত কোনো খারাপ কাজ করতে পারে না। এছাড়া সালাত অশ্লীল ও অন্যায় কাজ থেকে বিরত রাখে।

পবিত্র কোরানে সুরাহ আনকাবুত এ আল্লাহ (সুব.) বলেন, "নিশ্চয় সালাত অশ্লীল ও মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখে। "

সালাতের গুরুত্ব সম্পর্কে মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসসালাম (সা.) অনেক কথা বলেছেন । আবু হুরাইরা (রা.) বলেন, তিনি আল্লাহর রাসুলকে বলতে শুনেছেন, "বলতো যদি তোমাদের বাড়ির সামনে একটি নদী থাকে, আর সে তাতে প্রতিদিন পাঁচবার গোসল করে, তাহলে কি তার দেহে কোনো ময়লা থাকবে?" তারা উত্তর দিলেন, তার দেহে কোনো ময়লা থাকবে না। আল্লাহর রাসুল (সা.) বললেন, "এ হল পাঁচ ওয়াক্ত সালাতের উদাহরণ। এর মাধ্যমে আল্লাহ তায়ালা বান্দার গুনাহ সমুহ মিটিয়ে দেন। "(অধ্যায় ৯/৬, হাদিস নং ৫২৮, সাহিহ বুখারি)

আসুন দশ বছর বয়সী শিশুসহ আমরা সবাই নির্ধারিত সময়ে দিনে-রাতে পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আদায় করি। (সাধারণত সাত বছর বয়স হলে শিশুকে সালাত শিক্ষা দিতে হবে। আর দশ বছর বয়সী শিশুদের সালাত আদায় করতে কঠোরভাবে তাগিদ দিতে হবে।)

ইসলামী শরীয়ত প্রত্যেক প্রাপ্ত বয়স্ক সুআথ ব্যক্তির উপর দৈন্দদিন পাঁচ ওয়াক্ত সালাত ফরজ করেছে।।ফজর, যোহর, আসর,মাগরিব,ও এশা। মহান আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরাআনে সরাসরি আয়াতের মাধ্যমে এই পাঁচ ওয়াক্ত স্বালাতকে ফরজ ঘো ষণ করেছেন।
ইরশাদ হচ্ছে সুরা ত্ব হায় -
অর্থ : " আর তারা যা বলে সে সম্পর্কে আপনি ধৈর্যধারণ করুন। আর আপনি স্বলাত আদায় করুন সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের পুর্বে ,রাত্রিকালে এবং দিবসের প্রান্তসমুহে ।যাতে করে তুমি সন্তুষ্ট হতে পারো।।
============== সুরা-- ত্ব হা (আয়াত- ১৩০)===============

দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত নামায ফরয। মুমিন মাত্রই যত্নের সাথে পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায় করে থাকেন। তবে মানবজাতির চিরশত্রু ইবলিস সর্বদাই চেষ্টা করে, যেন মুমিনগণ নামায থেকে গাফেল হয়ে পড়ে। শয়তানের ধোঁকা ও গাফলতের কারণে অনেকেই নামাযে অবহেলা করেন বা নামায ছেড়ে দেন; যা মুমিনের জন্য অনেক বড় ক্ষতির কারণ। বিশেষ করে ফজর ও আসরের নামাযে বেশি গাফলতি হয়ে থাকে। মহান রাব্বুল আলামীন তাই কুরআনুল কারীমে এই দুই নামাযের প্রতি সবিশেষ গুরুত্ব দেওয়ার কথা বলেছেন। ইরশাদ হয়েছে-

حٰفِظُوْا عَلَى الصَّلَوٰتِ وَ الصَّلٰوةِ الْوُسْطٰى.

তোমরা সকল নামায এবং (বিশেষ করে) মধ্যবর্তী (তথা আসরের) নামাযের প্রতি যত্নবান হও। -সূরা বাকারা (০২) : ২৩৮

অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে-

وَ سَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوْعِ الشَّمْسِ وَ قَبْلَ غُرُوْبِهَا.

এবং স্বীয় রবের সপ্রশংস পবিত্রতা বর্ণনা করতে থাকুন; সূর্যোদয়ের পূর্বে ও সূর্যাস্তের পূর্বে। -সূরা ত্ব-হা (২০) : ১৩০

এই আয়াতে গাফলতের দুই ওয়াক্ত ফজর ও আসরের নামাযের কথা উল্লেখ করে এর সবিশেষ গুরুত্ব বোঝানো হয়েছে।

যাইহোক, এ দুই গুরুত্বপূর্ণ নামাযের মধ্যে আজ আমরা আলোচনা করব ফজরের নামায বিষয়ে; যে নামাযের মাধ্যমে মুমিনের দিবসের সূচনা হয়। এই নামাযের গুরুত্ব ও ফযীলত সম্পর্কে বেশ কিছু আয়াত ও হাদীস বর্ণিত হয়েছে; সেখান থেকে কিছু বিষয় আলোচনা করব ইনশাআল্লাহ।

এক. আল্লাহ কসম করেছেন ফজরের

প্রতি ওয়াক্ত নামাযই গুরুত্বপূর্ণ। তবে ফজরের গুরুত্ব অন্য সব ওয়াক্তের তুলনায় বেশি। কুরআনে কারীমে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন ফজরের কসম করেছেন। ইরশাদ হয়েছে-

وَ الْفَجْرِ ۙ وَ لَيَالٍ عَشْرٍ.

কসম ফজর-কালের। এবং দশ রাতের। -সূরা ফাজর (৮৯) : ১-২

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের উপরই কসম করেন। যেহেতু আল্লাহ ফজরের কসম করেছেন, তাই এটি সুস্পষ্ট যে, আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের কাছে এই সময় এবং এই সময়ে আদায়কৃত নামাযের গুরুত্ব অন্য সময় ও নামাযের তুলনায় বেশি।

ফজরের নামায এবং ফজরের তিলাওয়াতের গুরুত্ব প্রকাশ করে কুরআনে কারীমে ইরশাদ হয়েছে-

اَقِمِ الصَّلٰوةَ لِدُلُوْكِ الشَّمْسِ اِلٰى غَسَقِ الَّيْلِ وَ قُرْاٰنَ الْفَجْرِ ؕ اِنَّ قُرْاٰنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُوْدًا.

(হে নবী!) সূর্য হেলার সময় থেকে রাতের অন্ধকার পর্যন্ত নামায কায়েম করুন এবং ফজরের সময় কুরআন পাঠে যত্নবান থাকুন। স্মরণ রাখুন, ফজরের তিলাওয়াতে ঘটে থাকে সমাবেশ। -সূরা বনী ইসরাঈল (১৭) : ৭৮

শায়খুল ইসলাম মুফতী মুহাম্মাদ তাকী উসমানী দামাত বারাকাতুহুম তাফসীরে তাওযীহুল কুরআনে এ আয়াতের টীকায় লেখেন-

“মুফাসসিরগণ এর [অর্থাৎ ‘ফজরের তিলাওয়াতে ঘটে থাকে সমাবেশ’- একথার] দুই রকম ব্যাখ্যা করেছেন :

ক. অধিকাংশ মুফাসসির বলেন, ফজরের নামাযে যে তিলাওয়াত করা হয়, তাতে ফিরিশতাদের দল উপস্থিত থাকে। বিভিন্ন হাদীস দ্বারা জানা যায়, মানুষের তত্ত্বাবধানের কাজে যেসকল ফিরিশতা নিয়োজিত আছে, তারা নিজেদের দায়িত্ব পালাক্রমে আঞ্জাম দিয়ে থাকে। একদল আসে ফজরের সময়। তারা দিনের বেলা দায়িত্ব পালন করে। আরেক দল আসে আসরের সময়। তারা রাতের বেলা দায়িত্ব পালন করে। প্রথম দল ফজরের নামাযে

এসে শরীক হয় এবং কুরআন মাজীদের তিলাওয়াত শোনে। আয়াতে সে কথাই বলা হয়েছে।

খ. একদল মুফাসসির বলেন, এর দ্বারা মুসল্লীদের উপস্থিতি বোঝানো হয়েছে। অর্থাৎ, ফজরের নামাযে মানুষ যেহেতু ঘুম থেকে উঠে শরীক হয়, তাই তারা যাতে ঠিকভাবে নামায ধরতে পারে, সে লক্ষ্যে নামাযে তিলাওয়াত দীর্ঘ করা বাঞ্ছনীয়।"

সুতরাং ফজরের জামাতে উপস্থিত হওয়ার বিষয়ে সবিশেষ গুরুত্ব দেওয়া কাম্য।

আসলে ফজরের জামাতে উপস্থিত হতে না পারা বহু কল্যাণ থেকে নিজেকে বঞ্চিত করার নামান্তর।

দুই. ফজরের জামাতে উপস্থিত হতে পারা ঈমানী শক্তির পরিচায়ক

আবু হুরায়রা রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন-

إِنَّ أَثْقَلَ صَلاَةٍ عَلَى الْمُنَافِقِينَ صَلاَةُ الْعِشَاءِ، وَصَلاَةُ الْفَجْرِ، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِيهِمَا لَأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا.

এশা ও ফজরের নামায মুনাফিকদের জন্য সর্বাপেক্ষা কঠিন। তারা যদি জানত যে, এ নামাযের পুরস্কার বা সওয়াব কত, তাহলে হামাগুড়ি দিয়ে হলেও এ দুই নামাযে (জামাতে) হাযির হত। -সহীহ মুসলিম মুসলিম, হাদীস ৬৫১

তিন: ফজরের নামায আদায় করুন, আল্লাহ তাআলার জিম্মায় দিনযাপন করুন

সাহাবী জুনদুব আলকাসরী রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন-

مَنْ صَلَّى صَلَاةَ الصُّبْحِ فَهُوَ فِي ذِمَّةِ اللهِ..ِ

যে ব্যক্তি ফজরের নামায আদায় করল সে আল্লাহর যিম্মায় চলে গেল।... -সহীহ মুসলিম মুসলিম, হাদীস ৬৫৭

ইমাম কুরতুবী রাহ. বলেন, فِي ذِمَّةِ اللهِ অর্থ হল-

في أمان الله وفي جواره.

আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের নিরাপত্তা ও আশ্রয়ে থাকা।

যে আল্লাহ তাআলার আশ্রয়ে থাকে, কেউ তার কোনো ক্ষতি করতে পারে না। -আলমুফহিম লিল কুরতুবী ২/২৮২ লিল কুরতুবী ২/২৮২

চার: ফিরিশতাগণ আল্লাহর কাছে আপনার পক্ষে সাক্ষী হবেন

আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন-

يَتَعَاقَبُونَ فِيكُمْ مَلَائِكَةٌ بِاللَّيْلِ، وَمَلَائِكَةٌ بِالنَّهَارِ، وَيَجْتَمِعُونَ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ، وَصَلَاةِ الْعَصْرِ، ثُمَّ يَعْرُجُ الَّذِينَ بَاتُوا فِيكُمْ، فَيَسْأَلُهُمْ رَبُّهُمْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِهِمْ: كَيْفَ تَرَكْتُمْ عِبَادِي؟ فَيَقُولُونَ: تَرَكْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُّونَ، وَأَتَيْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُّون.َ

ফিরিশতাগণ পালা বদল করে তোমাদের মাঝে আগমণ করেন। এক দল দিনে, এক দল রাতে। আসর ও ফজরের নামাযে উভয় দল একত্র হন। তারপর তোমাদের মাঝে রাত যাপনকারী দলটি যখন উঠে যান, তাদের প্রতিপালক তাদের জিজ্ঞাসা করেন, আমার বান্দাদের কোন্ অবস্থায় দেখে এলে? অবশ্য তিনি নিজেই বান্দাদের ব্যাপারে সর্বাধিক জ্ঞাত।

উত্তরে ফিরিশতারা বলেন, আমরা তাদের নামাযরত দেখে এসেছি। আমরা যখন গিয়েছিলাম তখনও তারা নামাযরত ছিল। -সহীহ মুসলিম মুসলিম, হাদীস ৬৩২

সুতরাং যে ব্যক্তি নিয়মিত ফজর ও আসরের নামায জামাতে আদায় করছে ফিরিশতারা আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের কাছে তার ব্যাপারে সাক্ষ্য প্রদান করছে- আমরা যখন পৃথিবীতে গিয়েছি তাকে নামাযরত দেখেছি, আবার যখন পৃথিবী থেকে প্রস্থান করেছি তখনও তাকে নামাযরত দেখেছি। বান্দার জন্য ফিরিশতাদের এ সাক্ষ্য কত মূল্যবান! এ দুই নামাযে যত্নবান হওয়ার ফলে ফিরিশতারা এমনভাবে তার পক্ষে সাক্ষ্য দিচ্ছে, যেন সে সারাদিনই সালাত-ইবাদতে মগ্ন ছিল।

পাঁচ. জান্নাতের সুসংবাদ

সাহাবী আবু মূসা রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন-

مَنْ صَلَّى الْبَرْدَيْنِ دَخَلَ الْجَنَّةَ.

যে ব্যক্তি দুই ঠাণ্ডার সময়ের (অর্থাৎ ফজর ও এশার) নামায আদায় করবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। -সহীহ বুখারী বুখারী, হাদীস ৫৪৭; সহীহ মুসলিম, হাদীস ৬৩৫

জান্নাত অর্জন একজন মুমিনের পরম চাওয়া। যত ইবাদত-রিয়াযত এবং মেহনত-মুজাহাদা সবকিছুর মূল উদ্দেশ্য হল আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন এবং জান্নাত লাভ। জান্নাত লাভের সুসংবাদ শুনতে মুমিন খুব পছন্দ করে। সুতরাং এশা ও ফজরের ব্যাপারে যত্নবান হোন এবং নবীজীর যবানে জান্নাতের সুসংবাদ শুনে আনন্দিত হোন। আল্লাহ সকল মুমিনকে জান্নাতের জন্য কবুল করে নিন।

ছয় সারা রাত ইবাদতের সওয়াব অর্জন করুন

উসমান ইবনে আফফান রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন-

مَنْ صَلّى الْعِشَاءَ فِي جَمَاعَةٍ فَكَأَنَّمَا قَامَ نِصْفَ اللَّيْلِ، وَمَنْ صَلّٰى الصُّبْحَ فِي جَمَاعَةٍ فَكَأَنَّمَا صَلّٰى اللَّيْلَ كُلَّهُ.

যে ব্যক্তি এশার নামায জামাতে আদায় করল সে যেন অর্ধরাত নামাযে দণ্ডায়মান থাকল। যে ব্যক্তি ফজরের নামায জামাতে আদায় করল সে যেন সারা রাত নামায আদায় করল। -সহীহ মুসলিম মুসলিম, হাদীস ৬৫৬

এই হাদীসটি একজন মুমিনের জন্য বিশাল সুসংবাদ। কারণ, সারা রাত ঘুমিয়ে থেকেও রাতভর নামায আদায়ের সওয়াব আমলনামায় লেখা হচ্ছে।

দুই নামায জামাতে আদায়ের মাধ্যমে সারা রাত ইবাদতের সওয়াবের অধিকারী হতে পারা অবশ্যই একজন মুমিনের জন্য অত্যন্ত আনন্দদায়ক। আল্লাহ বড় মেহেরবান!

কোনো বুদ্ধিমানই এ ফযীলত থেকে নিজেকে বঞ্চিত করবে না।

সাত: ফজরের নামায আদায়কারী লাভ করবে আল্লাহর দীদার

সাহাবী জারীর ইবনে আব্দুল্লাহ রা. বলেন-

كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ نَظَرَ إِلَى القَمَرِ لَيْلَةَ البَدْرِ، فَقَالَ: أَمَا إِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ رَبَّكُمْ كَمَا تَرَوْنَ هَذَا، لاَ تُضَامُّونَ - أَوْ لاَ تُضَاهُونَ - فِي رُؤْيَتِهِ، فَإِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ لاَ تُغْلَبُوا عَلَى صَلاَةٍ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا، فَافْعَلُوا، ثُمَّ قَالَ: وَ سَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوْعِ الشَّمْسِ وَ قَبْلَ غُرُوْبِهَا.

আমরা একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে বসা ছিলাম। হঠাৎ তিনি পূর্ণিমার চাঁদের দিকে তাকিয়ে বললেন, তোমরা অচিরেই তোমাদের রবকে দেখতে পাবে, যেমন এ চাঁদ দেখতে পাচ্ছ। তোমরা আল্লাহকে দেখতে কোনো প্রকার ভিড়ের সম্মুখীন হবে না। যদি এ নিআমত লাভ করতে চাও, তাহলে সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের পূর্বের নামাযের (অর্থাৎ ফজর ও আসরের) প্রতি যথাসাধ্য যত্নবান হও (কোনো প্রকার গাফলতের শিকার হয়ো না এবং শয়তানের কাছে পরাস্ত হয়ো না)। অতঃপর নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কুরআনে কারীমের এ আয়াতটি তিলাওয়াত করেন-

وَ سَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوْعِ الشَّمْسِ وَ قَبْلَ غُرُوْبِهَا.

[এবং স্বীয় রবের সপ্রশংস পবিত্রতা বর্ণনা করতে থাকুন- সূর্যোদয়ের পূর্বে ও সূর্যাস্তের পূর্বে। -সূরা ত্ব-হা (২০) : ১৩০] ত্ব-হা (২০) : ১৩০] -সহীহ মুসলিম মুসলিম, হাদীস ৬৩৩; সহীহ বুখারী, হাদীস ৪৮৫১

আলোচ্য হাদীসটিতে বিশেষভাবে মনোযোগ দেওয়ার মতো বাক্য হল-

فَإِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ لاَ تُغْلَبُوا...

অর্থাৎ, তোমরা এ নামাযদ্বয়ের ব্যাপারে শয়তান বা গাফলতের কাছে পরাস্ত হয়ো না।

বোঝা যাচ্ছে, আসর ও ফজরের নামায আদায়ের ক্ষেত্রে মানবীয় দুর্বলতা ও গাফলতের একটা বিষয় রয়েছে। এসময় মানুষ ঘুমে বা বিশ্রামে থাকে এবং গাফলতের শিকার থাকে। ফলে নফসের সাথে লড়াই করে নামাযের জন্য জামাতে উপস্থিত হওয়া কষ্টসাধ্য হয়ে পড়ে। আর এর সাথে যুক্ত হয় মানবজাতির চিরশত্রু শয়তানের ওয়াসওয়াসা! শয়তান বলতে থাকে, ‘আজ না হয় থাক, কাল থেকে ইনশাআল্লাহ...’, ‘বাসায় নামায আদায় করলেও তো হয়, সওয়াব একটু কম হবে, কিন্তু নামায তো হয়ে যাবে’ ইত্যাদি। এসব কারণে বনী আদম কাবু হয়ে যায়। পরাস্ত হয়ে যায় নফস ও শয়তানের কাছে। তাই এই দুই নামাযের ব্যাপারে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিশেষ গুরুত্বারোপ করেছেন।

যেহেতু নফস ও শয়তানের সাথে অনেক মুজাহাদা করে একজন মুমিনকে এই দুই ওয়াক্ত নামায আদায় করতে হয়, তাই আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অনেক বড় পুরস্কারের ঘোষণা দিয়েছেন; আল্লাহর দীদার লাভের পুরস্কার! বান্দা আপন রবকে দেখতে পাবে- এর চেয়ে বড় পাওয়া ও

বড় পুরস্কার আর কী হতে পারে। এ পুরস্কার লাভের জন্য তো বান্দা যেকোনো কষ্ট স্বীকার করতেও রাজি।

আট. জাহান্নাম থেকে মুক্তির পরোয়ানা

উমারা ইবনে রুআইবা রা. বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি-

َلَنْ يَلِجَ النَّارَ أَحَدٌ صَلَّى قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ، وَقَبْلَ غُرُوبِهَا- يَعْنِي الْفَجْرَ وَالْعَصْر.

যে ব্যক্তি সূর্যোদয়ের ও সূর্যাস্তের পূর্বে অর্থাৎ ফজর ও আসরের নামায আদায় করে সে কখনও জাহান্নামে প্রবেশ করবে না। -সহীহ মুসলিম মুসলিম, হাদীস ৬৩৪

মানুষের বড় বড় সফলতার একটি হল, জাহান্নাম থেকে বাঁচতে পারা। জান্নাতের আশাও যেমন থাকবে, তেমনি জাহান্নাম থেকে বাঁচার আকুতিও থাকতে হবে; তবেই চূড়ান্ত সফলতা অর্জন হবে। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন কুরআনে কারীমে ইরশাদ করেন-

ففَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَ اُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ.َ

যাকে জাহান্নাম থেকে পরিত্রাণ দিয়ে জান্নাতে দাখিল করা হল সে-ই সফলকাম হল। -সূরা আলে ইমরান (৩) : ১৮৫ আলে ইমরান (৩) : ১৮৫

নয়: দুনিয়া ও দুনিয়ার মাঝের সবকিছুর চেয়ে দামী কিছু পেতে চাই!

উম্মুল মুমিনীন আয়েশা রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন-

رَكْعَتَا الْفَجْرِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا.

ফজরের দুই রাকাআত নামায (আমার কাছে) দুনিয়া ও এর মাঝে যা কিছু আছে সবকিছু থেকে উত্তম। -সহীহ মুসলিম মুসলিম, হাদীস ৭২৫

সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত মানুষ দুনিয়া কামাই করার জন্য কত পরিশ্রমই না করে। অথচ এই দুনিয়া ক্ষণস্থায়ী। অতি শীঘ্রই তা শেষ হয়ে যাবে। অপরদিকে আখেরাত চিরস্থায়ী। একজন মানুষের মৃত্যুর মধ্য দিয়ে পরকালের জীবন শুরু হবে; কিন্তু শেষ হবে না কোনোদিন-অনিঃশেষ। এই জীবনের পাথেয় হল ইবাদত ও আমল। ফজরের দুই রাকাত নামায এই অনিঃশেষ জীবনের এক মূল্যবান পাথেয়।-অনিঃশেষ। এই জীবনের পাথেয় হল ইবাদত ও আমল। ফজরের দুই রাকাত নামায এই অনিঃশেষ জীবনের এক মূল্যবান পাথেয়।
দশ:. কিয়ামতের দিন নূরপ্রাপ্তির সুসংবাদ

আখেরাত জীবনের কঠিন কঠিন ঘাটি পার হওয়ার জন্য প্রয়োজন নূর ও আলোর। রাতের শেষ অন্ধকারে আদায় করা এই নামায আমার জন্য শেষ দিবসের আলো হবে; যা আমাকে জান্নাত পর্যন্ত পথ চলতে সাহায্য করবে; যা না হলে আমি সেখানের অন্ধকারে হারিয়ে যাব। যদি নূরের অধিকারী হতে পারি, তাহলেই পৌঁছতে পারব পরম কাঙ্ক্ষিত জান্নাতে।

বুরায়দা রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন-

بَشِّرِ الْمَشَّائِينَ فِي الظُّلَمِ إِلَى الْمَسَاجِدِ بِالنُّورِ التَّامِّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

অন্ধকারে পায়ে হেঁটে (ফজরের নামায আদায় করতে) মসজিদে গমনকারী ব্যক্তিদেরকে সুসংবাদ দাও- কিয়ামতের দিন তাদেরকে পরিপূর্ণ নূর দান করা হবে। -সুনানে আবু দাউদ আবু দাউদ, হাদীস ৫৬১; জামে তিরমিযী, হাদীস ২২৩

শেষ কথা

যত বড় বিষয়, তা অর্জনের জন্য আমাদের প্রস্তুতিও হয় তত আগ থেকে এবং সে পরিমাণ গুরুত্বের সাথে। ফজরের নামাযের এসকল পুরস্কার ও ফযীলত যদি লাভ করতে চাই, তাহলে আমাদেরকে এর জন্য আগে থেকে প্রস্তুতি নিতে হবে। কেবল মৌখিক ইচ্ছা আর (প্রচেষ্টাহীন) দুআ যথেষ্ট নয়। আমার ইচ্ছা ও দুআ অনুযায়ী আমার সারাদিনের কাজ গুছিয়ে আনতে হবে। রাতে আগে আগে শুয়ে যেতে হবে। রাতে ঘুমাব দেরি করে আর আকাঙ্ক্ষা করব- সময়মত ঘুম ভাঙার- তা হবে না।

আসলে চেষ্টা তো থাকবে একটু আগে উঠে দুই-চার রাকাত তাহাজ্জুদ আদায়ের; তাহলে আশা করা যায়, আন্তত ফজর কখনো কাযা হবে না। তবে এজন্য রাতে আগে আগে ঘুমানোর কোনো বিকল্প নেই।

আমরা নবীজীর শেষ রাতের ইবাদতের কথা শুনি এবং নিজের জন্য তা কামনা করি; কিন্তু এটার প্রতি আমাদের মোটেও ভ্রুক্ষেপ নেই যে, নবীজী এশার পর দ্রুত ঘুমিয়ে যেতেন এবং আমাদেরকেও দ্রুত ঘুমিয়ে যেতে বলেছেন। ফলে এশার পর গল্প-গুজবে লিপ্ত হওয়া মাকরূহ। তাই আসুন রাতে আগে শুয়ে যাওয়ার পরিকল্পনা করি, তাহাজ্জুদ আদায় করি এবং জামাতের সাথে ফজর আদায় করে লাভ করি দুনিয়া ও আখেরাতের নূর ও আলো।

গাফলতকালের দুই ওয়াক্ত নামায যে নিয়মিত আদায় করতে পারে, তার জন্য বাকি নামাযগুলো আদায় করা আর তেমন কঠিন থাকে না। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে সকল নামায নিয়মিত জামাতের সাথে মসজিদে গিয়ে আদায় করার তাওফীক দান করুন- আমীন।

নামাজ না পড়ার কঠিন পরিণতি

নামাজ ইসলামের গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভ। মহানবী (সা.) ইন্তেকালের আগে সর্বশেষ যে ব্যাপারে অসিয়ত করেছেন, সেটি হলো নামাজ।

আনাস (রা.)-এর সূত্রে বর্ণিত, মহানবী (সা.) ইন্তেকালের আগে নামাজের ব্যাপারে যত্নশীল হওয়া এবং অধীনদের প্রতি সহনশীল হওয়ার অসিয়ত করেছেন।

আবু উমামা বাহিলি (রা.) বলেন, আমি রাসুলুল্লাহ (সা.)-কে বিদায় হজের ভাষণে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন, ‘তোমরা নিজ প্রতিপালক আল্লাহকে ভয় করো, তোমাদের পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ আদায় করো, তোমাদের রমজানে রোজা রাখো, তোমাদের সম্পদের জাকাত আদায় করো এবং (নীতিবান) আমিরের আনুগত্য করো, তাহলেই তোমরা স্বীয় রবের তৈরি জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে।

’ (তিরমিজি, হাদিস : ৬১৬)

নামাজের গুরুত্ব

ঈমানের পর ইসলামের সবচেয়ে বড় স্তম্ভ হলো নামাজ। রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন, ‘নামাজ হলো দ্বিনের স্তম্ভ।

’ সুতরাং বড় বড় মজবুত অট্টালিকা নির্মাণ করতে গেলে যেমন মূল ফাউন্ডেশনের দিকে লক্ষ রাখা অতি জরুরি, তেমনি নিজের দ্বিন ও ঈমানকে মজবুত রাখতে হলে নামাজের প্রতি যত্নবান হওয়া আরো বেশি জরুরি। সব নবী-রাসুলের শরিয়তে নামাজ আদায় করা আবশ্যক ছিল।

(শরহু মায়ানিল আসার, হাদিস : ৯৬২)

নামাজ এমন গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত, যা কখনো ছেড়ে দেওয়ার অবকাশ নেই। ইমরান ইবনে হুসাইন (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন, ‘তোমরা দাঁড়িয়ে নামাজ পড়ো। যদি দাঁড়াতে সক্ষম না হও, তাহলে বসে আদায় করো। তাতেও যদি সক্ষম না হও, তবে শুয়ে আদায় করো। ’ (সহিহ বুখারি, হাদিস : ১১১৭)

বেনামাজির শাস্তি

নামাজ না পড়া জাহান্নামে যাওয়ার কারণ। আল্লাহ তাআলা পবিত্র কোরআনে ইরশাদ করেন, জান্নাতের অধিবাসীরা (জান্নাতে যাওয়ার পর) জাহান্নামিদের জিজ্ঞেস করবে, 'কোন জিনিস তোমাদের জাহান্নামে নিক্ষেপ করল? তারা বলবে, আমরা নামাজ পড়তাম না...। ' (সুরা মুদ্দাচ্ছির, আয়াত : ৪২-৪৩)

অন্য আয়াতে বলা হয়েছে, 'এবং যে আমার স্মরণ (নামাজ) থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে, তার জীবিকা হবে সংকীর্ণ এবং আমি তাকে কিয়ামত দিবসে উত্থিত করব অন্ধ অবস্থায়। ' (সুরা: ত্ব-হা, আয়াত : ১২৪)

রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন, 'একজন মুসলমান আর শিরক-কুফরের মধ্যে পার্থক্য হলো নামাজ। ' অর্থাৎ বেনামাজি আর মুশরিকের মধ্যে কোনো পার্থক্য থাকে না। (সহিহ মুসলিম, হাদিস : ৮২)

এ ছাড়া মহানবী (সা.) বেনামাজির শাস্তি সম্পর্কে বলেন, 'জাহান্নামে তাদের মাথা পাথর দ্বারা চূর্ণবিচূর্ণ করা হবে। ' (সহিহ বুখারি, হাদিস : ১১৪৩)

নামাজের ব্যাপারে তাই সব ধরনের অলসতা দূর করে অত্যধিক যত্নশীল হওয়া আমাদের অবশ্য কর্তব্য। আল্লাহ তাআলা বলেন, 'তোমরা নামাজের প্রতি যত্নবান হও, বিশেষত মধ্যবর্তী নামাজের ব্যাপারে। আর আল্লাহর সম্মুখে দাঁড়াও একান্ত আদবের সঙ্গে। ' (সুরা : বাকারাহ, আয়াত : ২৩৮)

নামাজে অলসতায় ১৫ শাস্তি

ইসলামের দ্বিতীয় স্তম্ভ নামাজ। ইমানের পর নামাজের চেয়ে গুরুত্ব অন্য কোনো ইবাদতে প্রদান করা হয়নি।

পবিত্র কোরআনে কারিমে ৮৩ বার নামাজের আলোচনা এসেছে। নামাজের ব্যাপক কল্যাণসমূহের উল্লেখযোগ্য একটি হলো নামাজ অশ্লীল ও মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখে।

আর নামাজের ব্যাপারে যারা উদাসীন থাকে তাদের ব্যাপারে শাস্তির ঘোষণা দেওয়া হয়েছে। আল্লাহতায়ালা বলেন, 'দুর্ভোগ সেসব নামাজির জন্য নিজেদের নামাজের ব্যাপারে যারা থাকে গাফেল।

' -সূরা মাউন : ৪-৫

রোজ হাশরে নামাজের মাধ্যমেই হিসাব-নিকাশ শুরু হবে। যার নামাজ সঠিক হবে তার অন্যান্য আমলও সঠিক বলে বিবেচিত হবে।

আর যার নামাজ অসুন্দর হবে তার অন্যান্য আমলও অসুন্দর বলে গণ্য হবে। তাই প্রত্যেক মুসলমানের উচিৎ গুরুত্ব সহকারে নামাজ আদায়ে সচেষ্ট হওয়া। যে ব্যক্তি নামাজের ব্যাপারে অলসতা করে তাকে ১৫ ধরনের শাস্তি দেওয়া হবে। তার মধ্য থেকে পাঁচ ধরনের শাস্তি দুনিয়াতে। তিন ধরনের শাস্তি মৃত্যুর সময়। তিন ধরনের শাস্তি কবরে। চার ধরনের শাস্তি কবর থেকে উঠানোর পর।

দুনিয়াতে যে পাঁচ ধরনের শাস্তি হবে তা হলো-
১. তার জীবনের বরকত ছিনিয়ে নেওয়া হবে।
২. তার চেহারা থেকে নেককারের নূর দূর করে দেওয়া হবে।
৩. তার নেক কাজের কোনো বদলা দেওয়া হবে না।
৪. তার কোনো দোয়া কবুল হবে না।
৫. নেক বান্দাদের দোয়ার মধ্যে তার কোনো হক থাকবে না।
মৃত্যুর সময় যে তিন ধরনের শাস্তি দেওয়া হবে-
১. জিল্লতি ও অপমানের সঙ্গে সে মৃত্যুবরণ করবে।
২. ক্ষুধার্ত অবস্থায় সে মৃত্যুবরণ করবে।
৩. এমন পিপাসার্ত অবস্থায় সে মৃত্যুবরণ করবে যে, সমুদ্র পরিমাণ পানি পান করালেও তার পিপাসা মিটবে না।
কবরে যে তিন ধরনের শাস্তি হবে সেগুলো হলো-
১. কবর তার জন্য খুব সংকীর্ণ হয়ে যাবে। এমন সংকীর্ণ যে, এক পাশের বুকের হাড় আরেক পাশে ঢুকে যাবে।
২. তার কবরে আগুন জ্বালিয়ে দেওয়া হবে।
৩. তার কবরে এমন একটি সাপ নিযুক্ত করা হবে, যে সাপের চোখ হবে আগুনের, নখগুলো হবে লোহার। তার প্রত্যেকটি নখ লম্বা হবে একদিনের দূরত্বের পথ। ওই সাপের আওয়াজ হবে বজ্রের আওয়াজের মতো বিকট। সাপ ওই বেনামাজিকে বলতে থাকবে, আমাকে আমার রব তোমার জন্য নিযুক্ত করেছেন; যাতে ফজরের নামাজ নষ্ট করার কারণে সূর্যোদয় পর্যন্ত দংশন করতে থাকি। জোহরের নামাজ নষ্ট করার কারণে আসর পর্যন্ত দংশন করতে থাকি। আসরের নামাজ নষ্ট করার কারণে মাগরিব পর্যন্ত আর মাগরিবের নামাজ নষ্ট করার কারণে এশা পর্যন্ত, আর এশার নামাজ নষ্ট করার কারণে ফজর পর্যন্ত দংশন করতে থাকি। এ সাপ দংশন করার সঙ্গে সঙ্গে সে ৭০ হাত মাটির নিচে ঢুকে যাবে (উঠিয়ে আবার দংশন করবে) এভাবে কেয়ামত পর্যন্ত এই সাপ তাকে আজাব দিতে থাকবে।

কবর থেকে উঠানোর পর বেনামাজিকে যে চার ধরনের আজাব দেওয়া হবে-

১. তার হিসাব খুব কঠিনভাবে নেওয়া হবে।

২. আল্লাহতায়ালা তার ওপর অসন্তুষ্ট হয়ে থাকবেন।

৩. তাকে জাহান্নামে দেওয়া হবে।

৪. তার চেহারায় তিনটি লাইন লেখা থাকবে-

১. হে আল্লাহর হক নষ্টকারী!

২. হে আল্লাহর গোস্বায় পতিত ব্যক্তি!

৩. তুমি দুনিয়াতে যেমন আল্লাহর হক নষ্ট করেছিলে তেমনি আজ আল্লাহর রহমত থেকে তুমি নিরাশ। এভাবে বেনামাজিকে ১৫ ধরনের শাস্তি দেওয়া হবে।

আল্লাহতায়ালা সবাইকে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ যথাযথভাবে আদায় করার তওফিক দান করুন। আমিন।

ফরজ নামাজ ইচ্ছাকৃতভাবে ছেড়ে দিলে যে গুনাহ

ইচ্ছাকৃতভাবে ফরজ নামাজ ছেড়ে দিলে আল্লাহর জিম্মাদারি থেকে বেরিয়ে যায়। সব কিছু হারিয়ে ফেলে। মহান আল্লাহ ওই ব্যক্তির ওপর থেকে তার জিম্মাদারি বা রক্ষণাবেক্ষণ তুলে নেন। হাদিসে পাকে এসেছে-

হজরত মুআজ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে দশটি নসিহত করেন, তার মধ্যে বিশেষ একটি এটাও যে তুমি ইচ্ছাকৃত ফরজ নামাজ ত্যাগ করো না। কারণ, যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃত ফরজ নামাজ ত্যাগ করল তার ওপর আল্লাহ তাআলার কোনো জিম্মাদারি থাকল না।' (মুসনাদ আহমাদ ৫/২৩৮)

সব নবিদের যুগেই নামাজের বিধান ছিল। তবে পদ্ধতিগতভাবে পার্থক্য ছিল। কিন্তু তাদের পরবর্তীতে লোকেরা নামাজের ব্যাপারে অবহেলা শুরু করে। অথচ ফরজ নামাজ আদায় না করা ভয়াবহ গুনাহের কাজ। আর এর কঠিন পরিণতি হলো- চিরস্থায়ী জাহান্নাম।

নামাজ না পড়ার ক্ষতি:

নামাজ না পড়লে ইহকালেও বহু ক্ষতি সাধিত হয়। হজরত বুরাইদা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, 'যে ব্যক্তি আসরের নামাজ পরিত্যাগ করলো- তার সব আমল বরবাদ হয়ে গেল।' (বুখারি ৫৫৩, ৫৯৪)

হজরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেছেন, আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, 'যে ব্যক্তির আসরের নামাজ ছুটে গেল তার পরিবারবর্গ ও ধন-সম্পদের যেন বিরাট ক্ষতি হয়ে গেল।' (বুখারি ৫৫২)

আল্লাহ তাআলা দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ ফরজ করেছেন। যে যেখানে যে অবস্থাতেই থাকুক না কেন, নামাজ অবশ্যই আদায় করতে হয়। কেউ অসুস্থ হলে কিংবা যানবাহনে থাকলে, তার নামাজেরও সুরত এবং পদ্ধতি রয়েছে। বেনামাজিদের জন্য রয়েছে জাহান্নাম।

যে কারণে নামাজ আল্লাহর কাছে প্রিয় আমল

ঈমানের পর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল নামাজ। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর পক্ষ থেকে বার বার নামাজের তাগিদ পেয়েছেন। কুরআনে পাকে আল্লাহ তাআলা বিভিন্ন জায়গায় সরাসরি ৮২ বার সালাত শব্দ উল্লেখ করে নামাজের গুরুত্ব তুলে ধরেছেন।

তাই প্রিয়নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নামাজকে ঈমানের পর স্থান দিয়েছেন। নামাজের গুরুত্ব ও ফায়েদা সম্পর্কে সাহাবায়ে কেরামের সামনে অসংখ্য হাদিন বর্ণনা করেছেন

তন্মধ্যে একটি হাদিস হলো

হজরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞাসা করলাম- (হে আল্লাহর রাসুল!) আল্লাহর কাছে সবচেয়ে বেশি প্রিয় আমল কোনটি? রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, 'নামাজ'। (বুখারি ও মুসলিম)

উল্লেখিত হাদিস বর্ণনা প্রসঙ্গে বিশিষ্ট ইসলামি স্কলার আল্লামা মোল্লা আলি ক্বারী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, 'এ হাদিসের মাধ্যমেই আলেমগণ ঈমানের পর নামাজকে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় মনে করেনহজরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, 'আল্লাহ তাআলা মনোনীত সর্বোত্তম আমল হলো নামাজ। অতএব যে বেশি বেশি নামাজ পড়তে সক্ষম, সে যেন বেশি বেশি নামাজ পড়ে।

প্রিয়নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নামাজের গুরুত্ব বুঝাতে হাদিসের মাধ্যমে একটি উপমা প্রদান করেছেন।

হজরত আবু যর গিফারি রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন যে, নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এক সময় শীতকালে বাইরে (কোথা্র) তাশরিফ আনলেন। তখন গাছের পাথা ঝরার মওসুম ছিল। নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম গাছের একটি ডাল হাত দিয়ে ধরলেন। ফলে তার পাতা আরও বেশি ঝরতে লাগল।

অতঃপর তিনি বললেন, হে আবু যর! আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসুল! আমি উপস্থিত। তখন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করলেন-

'মুসলমান বান্দা যখন আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য নামাজ আদায় করে, তখন তার থেকে পাপসমূহ ঝরে পড়ে; যেমন এ গাছের পাতা ঝরে পড়ছে। (মুসনাদে আহমদ)

নামাজই একমাত্র ইবাদত; যার মাধ্যমে মানুষ দুনিয়ার সব কাজ ছেড়ে শুধুমাত্র আল্লাহর জন্য নিবেদিত হয়ে যায়। এ নামাজই মানুষকে দুনিয়ার সব পাপ-পংকিলতা থেকে ধুয়ে মুছে পাক-সাফ করে দেয়। দুনিয়ার সব অন্যায়-অনাচার থেকে হেফাজত করে

পরিশেষে...

নামাজের প্রতি যত্নবান হওয়া মুমিন মুসলমানরে ঈমানের দাবি ও ফরজ ইবাদত। নামাজি ব্যক্তিই হলো সফল। যার সুস্পষ্ট বর্ণনা দিয়েছেন প্রিয়নবি। তিনি বলেছেন-

'যে ব্যক্তি নামাজের প্রতি যত্নবান থাকে; কেয়ামতের দিন ওই নামাজ তার জন্য নূর হবে এবং হিসেবের সময় নামাজ তার জন্য দলিল হবে এবং নামাজ তার জন্য নাজাতের কারণ হবে।

পক্ষান্তরে

যে ব্যক্তি নামাজের প্রতি যত্নবান হবে না- কেয়ামতের দিন নামাজ তার জন্য নূর ও দলিল হবে না। তার জন্য নাজাতের কোনো সনদও থাকবে না। বরং ফেরাউন, হামান ও উবাই ইবনে খালফের সাথে তার হাশর হবে।'

আল্লাহ তাআলা মুসলিম উম্মাহকে সহিহ তরিকায় সঠিক পদ্ধতিতে নির্ধারিত সময়ে নামাজ আদায় করার তাওফিক দান করুন। ফরজ নামাজ আদায়ের পাশাপাশি নফল নামাজ আদায় করার তাওফিক দান করুন। নামাজকে পরকালের নাজাতের ওসিলা বানিয়ে দিন। আমিন।

ফজর ও ইশার নামাজের ফজিলত

সবগুলো ফরজ নামাজ জামাতের সাথে আদায়ের ব্যাপারেই যত্নবান হওয়া উচিত। বিশেষত ফজর ও ইশার নামাজের ব্যাপারে গুরুত্ব থাকা ইমান শুদ্ধ হওয়া ও মোনাফেকি থেকে দূরে থাকার লক্ষণ। নবিজি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন, মুনাফিকদের জন্য সবচেয়ে কঠিন নামাজ হলো ইশা ও ফজরের নামাজ। যদি তারা এই দুই ওয়াক্ত নামাজের সওয়াব সম্পর্কে জানতো, তাহলে হামাগুড়ি দিয়ে হলেও মসজিদে আসতো। (সহিহ বুখারি, সহিহ মুসলিম)।

আবু হোরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত আরেকটি হাদিসে ফজর ও ইশার নামাজসহ যে কোনো নামাজের সময় দ্রুত মসজিদে উপস্থিত হয়ে প্রথম কাতারে দাঁড়িয়ে নামাজ আদায়ের ফজিলত সম্পর্কে আল্লাহর রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, মানুষ যদি আজান ও প্রথম কাতারের সাওয়াবের কথা জানতো এবং লটারি ছাড়া তা লাভের কোন উপায় না থাকতো তবে তারা এর জন্য লটারি করতো। যদি নামাজে দ্রুত মসজিদে উপস্থিত হওয়ার ফজিলত মানুষ জানতো, তবে তারা এর জন্য প্রতিযোগিতা করতো। ইশা ও ফজরের সওয়াব যদি তারা জানতো, তবে তারা এ দুই নামাজের জন্য হামাগুড়ি দিয়ে হলেও মসজিদে আসতো। (সহিহ বুখারি, সহিহ মুসলিম)

আবদুর রহমান ইবনু আবূ আমরা (রহ.) বলেন, একদিন উসমান ইবনে আফফান (রা.) মাগরিবের নামাজের পর মসজিদে ঢুকে একা বসে ছিলেন। আমি তার কাছে গিয়ে বসলাম। তিনি বললেন, ভাতিজা! আমি আল্লাহর রাসুলকে (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলতে শুনেছি, যে ব্যাক্তি ইশার নামাজ জামাতের সাথে আদায় করল, সে যেন অর্ধরাত পর্যন্ত নামাজ আদায় করল। আর যে ব্যাক্তি ফজরের নামাজ জামাতের সাথে আদায় করল সে যেন সারা রাত নামাজ আদায় করল। (সহিহ মুসলিম: ১৩৬৬)

এ হাদিসগুলো থেকে বোঝা যায় ফজর ইশার নামাজ জামাতের সাথে আদায় করার ফজিলত অপরিসীম। মানুষ ইশা ও ফজরে মসজিদে উপস্থিত হয়ে জামাতের সাথে নামাজ আদায়ের ফজিলত যথাযথভাবে উপলব্ধি করতে পারলে অসুস্থতা থাকলেও মসজিদে গিয়ে নামাজ আদায়ের চেষ্টা করতো। তাই আমাদের সবারই প্রত্যেক ওয়াক্ত নামাজ মসজিদে গিয়ে আদায় করার চেষ্টা করা উচিত, অলসতা করে বাসায় বসে থাকা সমীচীন নয়

নামাযের খুশূ হাসিল হবে যেভাবে

মাওলানা মুহাম্মাদ আব্দুল মালেক

হামদ ও সালাতের পর...

গত কয়েক মজলিসে খুশূ সম্পর্কে আলোচনা হয়েছে। বলা হয়েছে, খুশূ কেবল বিশেষ কোনো আমলের বৈশিষ্ট্য নয়, বরং খুশূ মুমিনের যিন্দেগীর বৈশিষ্ট্য। মুমিনের পুরো যিন্দেগীই হতে হবে খুশূওয়ালা যিন্দেগী। দ্বীন-দুনিয়ার সকল কাজেই খুশূ থাকা চাই। খুশূ থাকতে হবে মুমিনের চলা-ফেরা, কথা-বার্তা, আচার-আচরণ, আওয়াজ-উচ্চারণ সবকিছুতে।

উদাহরণস্বরূপÑ হাঁটা-চলা ও কথাবার্তার খুশূ সম্পর্কে কুরআন করীমের ইরশাদ হয়েছেÑ

وَ لَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَ لَا تَمْشِ فِی الْاَرْضِ مَرَحًا اِنَّ اللهَ لَا یُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُوْرٍ، وَ اقْصِدْ فِیْ مَشْیِكَ وَ اغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ اِنَّ اَنْكَرَ الْاَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِیْرِ.

তুমি অহংকারবশত মানুষের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ো না এবং পৃথিবীতে দম্ভ করে চলো না। নিশ্চয় আল্লাহ কোনো দাম্ভিক, অহংকারীকে পছন্দ করেন না। তুমি হাঁটা-চলায় মধ্যমপন্থা অবলম্বন কর এবং কণ্ঠস্বর সংযত রাখ। নিশ্চয় সবচেয়ে অপ্রীতিকর আওয়াজ হল গাধার আওয়াজ! Ñসূরা লুকমান (৩১) : ১৮-১৯

এভাবে শরীরের প্রতিটা অঙ্গের খুশূ রয়েছে। তাই আমরা যদি এককথায় খুশূর অর্থ করতে চাই, তাহলে বলা যায়Ñ 'আমার প্রতিটা অঙ্গ শরীয়তের বিধান এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাহ মোতাবেক পরিচালিত হওয়া।'

প্রত্যেক নেকআমলের খুশূ রয়েছে। যেমন যাকাত আদায় করা বা আল্লাহর রাস্তায় দান করার খুশূ কী? শুনুন কুরআনের ভাষায়Ñ

وَ الَّذِیْنَ یُؤْتُوْنَ مَاۤ اٰتَوْا وَّ قُلُوْبُهُمْ وَجِلَةٌ اَنَّهُمْ اِلٰی رَبِّهِمْ رٰجِعُوْنَ.

এবং যারা যা কিছু দান করে, দান করার সময় তাদের অন্তর এই ভয়ে ভীত থাকে যে, তাদেরকে নিজ প্রতিপালকের কাছে ফিরে যেতে হবে। Ñসূরা মুমিনূন (২৩) : ৬০

অর্থাৎ নেককাজে খরচ করুক বা আল্লাহর কোনো বান্দাকে সাহায্য করুকÑ কোনো অবস্থাতেই তার মাথায় আসে না যে, আমি করুণা করছি, কিংবা আমি প্রশংসা বা কৃতজ্ঞতা পাবার যোগ্য; বরং নিজের হালাল অর্থ থেকে কম বেশ যা-ই পেশ করে, তার অন্তরটা থাকে ভীত-কম্পিত। কুরআনের ভাষায়Ñ

وَّ قُلُوْبُهُمْ وَجِلَةٌ.

(তাদের হৃদয় থাকে ভীত-কম্পিত।)

وَ يُطْعِمُوْنَ الطَّعَامَ عَلٰى حُبِّهٖ مِسْكِيْنًا وَّ يَتِيْمًا وَّ اَسِيْرًا، اِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللهِ لَا نُرِيْدُ مِنْكُمْ جَزَآءً وَّ لَا شُكُوْرًا، اِنَّا نَخَافُ مِنْ رَّبِّنَا يَوْمًا عَبُوْسًا قَمْطَرِيْرًا.

তারা আল্লাহর মহব্বতেÑ অভাবী, এতীম ও বন্দিকে আহার দান করে। (তাদের অভিব্যক্তি হল,) আমরা তো তোমাদের আহার করাই কেবল আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে। আমরা তোমাদের কাছে কোনো প্রতিদান চাই না এবং কৃতজ্ঞতাও না। আমরা তো আমাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে এক কঠিন, ভয়ংকর দিনের আশঙ্কা করি। Ñসূরা দাহর (৭৬) : ৮-১০

নেককার ব্যক্তিরা দান করে এই চিন্তায় থাকে যে, এর মধ্যে কোনো ধরনের রিয়া যুক্ত হচ্ছে না তো? বা পরবর্তীতে খোঁটা যুক্ত হবে না তো? কিংবা আমার অজান্তে কোনো সমস্যা যুক্ত হয়ে আমলটি বাতিল হয়ে যাবে না তো? আল্লাহ মেহেরবানি করে কবুল করবেন তো? আখেরাতে আমি মুক্তি পাব তো? এসব চিন্তা তাদেরকে ভীত-কম্পিত রাখে।

একটা বিষয় মনে রাখা জরুরিÑ যাকাত আদায় করার অর্থ মূলত গ্রহীতার ‘হক’ গ্রহীতার কাছে পৌঁছে দেওয়া। তেমনি আরো যেসব ক্ষেত্রে শরীয়ত খরচ করাকে জরুরি করে দিয়েছে, যেসব ক্ষেত্রে আমি আসলে কোনো দাতা-ই নই; আমি তো কেবল দায়িত্ব আদায় করছি মাত্র। কাজেই সেখানে আমি কাউকে কিছু দিচ্ছি বা কারো প্রতি অনুগ্রহ করছিÑ এমন কিছু ভাবার সুযোগই নেই।

এমনিতে যে কোনো দানের ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য। কারণ যা দেওয়া হচ্ছে, সেটা তো আল্লাহর দেওয়া রিযিক থেকেই দিচ্ছি। ইরশাদ হয়েছেÑ

وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُوْنَ.

এবং আমি তাদেরকে যা-কিছু দিয়েছি, তা থেকে (আল্লাহর সন্তোষজনক কাজে) ব্যয় করে। Ñসূরা বাকারা (০২) : ৩

মোটকথা, প্রত্যেক নেক কাজে খুশূ রয়েছে। জাগতিক সকল কাজেও খুশূ রয়েছে । বিনয়ী মানুষ যারা এবং বিনয় যাদের জীবনের অংশ Ñআর বিনয় তো মুমিনের দায়েমী সিফাতÑ তারা সর্বদা আল্লাহকে হাযির-নাযির মনে করে তাঁর সামনে বিনয়ী থাকে। হাঁ, কখনো গাফলত এসে যায়Ñ সেটা ভিন্ন কথা। কিন্তু যতক্ষণ একথা মনে থাকবে যে, আল্লাহ হাযির-নাযির এবং আমি আল্লাহর সামনে আছি, সেই সময়টাতে বান্দা বিনয়ী হবেই।

যেমন নিজের ঘরকে সাধারণত মানুষ নিরাপদ মনে করে। কেউ নিজের ঘরে যাচ্ছে মানে নিরাপদ আবাসস্থলের দিকে যাচ্ছে। অথচ ঘর তখনই নিরাপদ হতে পারে, যখন আল্লাহ তাআলা নিরাপত্তা দান করেন। কত মানুষের ঘরেই কত বিপদ আসে! কেউ আবার ঘর থেকে পালিয়ে বেড়ায়। কেন হয় এসব? কারণ বান্দার জন্য আল্লাহ যখন যে স্থানে নিরাপত্তা দান করেন তখন সে স্থানটাই তার জন্য নিরাপদ।

সুতরাং ঘরে প্রবেশ করার সময়ও খুশূ অবলম্বন করা চাই। ঘরে প্রবেশের সময় আগে ডান পা দিয়ে প্রবেশ করা, তবে জুতা খোলার সময় বাম পায়ের জুতা আগে খোলা তারপর ডান পায়ের জুতা খোলা। সালাম দেওয়া। বিসমিল্লাহ ও মাসনূন দুআ পড়ে প্রবেশ করা। অনুভূতির সঙ্গে দুআ পড়া। এই হল ঘরে প্রবেশের খুশূ।

এক হল দুআ পড়া। তারও অনেক সওয়াব। কিন্তু সঙ্গে যদি দুআর অনুভূতি জাগ্রত থাকে এবং দুআর অর্থ-মর্ম যেহেনে থাকে আর সে অনুভূতি ও অর্থ-মর্ম অন্তরে নিয়ে ঘরে প্রবেশ করতে পারে, তাহলে সেটি কিন্তু অনেক বড় বিষয়।

সুতরাং ঘরে প্রবেশের মাসনূন দুআর প্রতি আমরা যত্নবান হব। দুআটি এইÑ

اَللّٰهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَ الْمَوْلِجِ، وَخَيْرَ الْمَخْرَجِ، بِسْمِ اللهِ وَلَجْنَا، وَبِسْمِ اللهِ خَرَجْنَا، وَعَلَى اللهِ رَبِّنَا تَوَكَّلْنَا.

হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে কল্যাণকর প্রবেশ ও কল্যাণকর বহির্গমন প্রার্থনা করছি। আল্লাহর নামে আমরা প্রবেশ করি, আল্লাহর নামেই বের হই এবং আমাদের রব আল্লাহর ওপরেই আমরা ভরসা করি। Ñসুনানে আবু দাউদ, হাদীস ৫০৯৬

দুআর মর্মার্থ

এই দুআয় দুইটি বিষয়ে আরজি জানানো হয়েছেÑ

১. আমার প্রবেশটা যেন কল্যাণকর হয়। এমন যেন না হয় যে আমি বাহির থেকে অকল্যাণ নিয়ে ঘরে ফিরছি! ফলে ঘরটা আমার কারণে বে-বরকত হয়ে গেল!

২. আমার বহির্গমনটাও যেন কল্যাণকর হয়।

তাই আমি ঘরে প্রবেশের সময়ও 'বিসমিল্লাহ' বলি, বের হওয়ার সময়ও 'বিসমিল্লাহ' বলি। আর সর্বাবস্থায় আল্লাহর ওপরই ভরসা করি। কারণ তিনিই আমাদের রবÑপ্রতিপালক এবং তিনিই সমস্ত কল্যাণ ও বরকতের মালিক।

যাহোক এটা হল ঘরে প্রবেশের খুশূ। তেমনি ঘর থেকে বের হওয়ারও খুশূ রয়েছে। বের হওয়ার সময় আগে বাম পা দেব। কিন্তু জুতা পরার সময় ডান পায়ের জুতা আগে পরব। এবং বের হওয়ার দুআ পড়বÑ

بِسْمِ اللهِ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللهِ، لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ.

আমি আল্লাহর ওপর ভরসা করে বের হচ্ছি! সকল কল্যাণ একমাত্র আল্লাহর রহমতেই অর্জিত হতে পারে। সকল বালা-মসিবত ও অকল্যাণ থেকে একমাত্র আল্লাহর কুদরতেই রক্ষা পেতে পারি!

কেউ যখন এই দুআ পড়ে ঘর থেকে বের হয়, তখন সাথে সাথে ফেরেশতারা বলে ওঠেনÑ

هُدِيتَ، وَكُفِيتَ، وَوُقِيتَ!

তুমি সঠিক পথপ্রাপ্ত হয়েছ, তোমার সকল প্রয়োজনের ভার গ্রহণ করা হয়েছে এবং তুমি নিরাপত্তা লাভ করেছ। Ñসুনানে আবু দাউদ, হাদীস ৫০৯৫

অর্থাৎ ব্যস, তোমার জন্য এই দুআই যথেষ্ট হয়ে গিয়েছে। তুমি বাইরে গিয়ে কোনো সমস্যা বা মসিবতে পড়বে না। অনাকাঙ্ক্ষিত কোনো ঘটনার সম্মুখীন হবে না। হাঁ, আল্লাহ তাআলার হুকুমে কখনো হালত আসতেও পারে, কিন্তু দুআটা পড়ে বের হলে হয়তো ওরকম অনাকাঙ্ক্ষিত পরিস্থিতির শিকার হবে না। যদি কখনো পরিস্থিতির শিকার হতেও হয়, তখন করণীয় কী, সেটি আল্লাহ তাআলা দিলের মধ্যে ঢেলে দেবেন ইনশাআল্লাহ।

ফেরেশতারা দুআয় বলেনÑ

كُفِيتَ.

‘তোমার সকল প্রয়োজনের ভার গ্রহণ করা হয়েছে।’

এর মানে কেবল বাইরের বিষয় নয়; বরং আমি যে ঘর থেকে বের হচ্ছি, আমার ঘরও আল্লাহ তাআলার হাওয়ালায়। দুআর আবেদনের মধ্যে ঘর-বাহির উভয়টাই শামিল। অর্থাৎ উভয়টাই যেন আল্লাহর হেফাজতে থাকে।

ঘর থেকে বের হওয়ার আরেকটি দুআ

ঘর থেকে বের হয়ে কোথাও রওয়ানা দেওয়ার সময় আরেকটি দুআ পড়ার কথাও হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছেÑ

اَللّٰهُمَّ أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَضِلَّ أَوْ أُضَلَّ، أَوْ أَزِلَّ أَوْ أُزَلَّ، أَوْ أَظْلِمَ أَوْ أُظْلَمَ، أَوْ أَجْهَلَ أَوْ يُجْهَلَ عَلَيَّ.

হে আল্লাহ! আমি আপনার আশ্রয় গ্রহণ করছিÑ যেন আমি পথভ্রষ্ট না হই, আমাকেও যেন পথভ্রষ্ট করা না হয়। আমি যেন পদস্খলিত না হই, অন্য কেউ যেন আমার পদস্খলন না ঘটায়। আমি যেন কারো ওপর জুলুম না করি, আমার ওপরও যেন কেউ জুলুম না করে। আমি যেন মূর্খের আচরণ না করি, আমার সাথেও যেন মূর্খের আচরণ করা না হয়। Ñসুনানে আবু দাউদ, হাদীস ৫০৯৪

এই দুআর মধ্যে চারটি বিষয়ে আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করা হচ্ছেÑ

এক. আমি নিজেও যেন পথভ্রষ্ট না হই, অন্য কেউ যেন আমাকে পথভ্রষ্ট করতে না পারে।

হাদীসের শব্দ ব্যাপক। তাই এখানে রাস্তা ভুলে যাওয়া বা দিক হারিয়ে ফেলা, দ্বীন-ঈমান ও সিরাতে মুস্তাকীম থেকে বিচ্যুত হয়ে যাওয়াÑ সবই উদ্দেশ্য নেওয়া যেতে পারে।

নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দুআর একেকটি শব্দে বহুমাত্রিক অর্থ নিহিত থাকে। একই সঙ্গে অনেক বিষয়ের কল্যাণ যেমন প্রার্থনা করা যায়, তেমনি অনেক অকল্যাণ ও অনিষ্টতা থেকেও আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করা যায়।

দুই. আমি যেন পদস্খলিত না হই, অন্য কেউ যেন আমার পদস্খলন না ঘটায়। পিচ্ছিল পথে পড়ে যাওয়া, বাহন থেকে ছিটকে পড়া অথবা কোনো সড়ক দুর্ঘটনার শিকার হওয়াÑ সব ধরনের পদস্খলন থেকে আল্লাহ যেন আমাকে রক্ষা করেন।

তেমনি কোনো গোনাহে লিপ্ত হয়ে যাওয়া বা অসংগত কিছু করে ফেলা বা বলে ফেলা থেকে আল্লাহ যেন আমাকে হেফাজত করেন।

তিন. নিজেও যেন কারো ওপর জুলুম না করি, আমার প্রতিও যেন কেউ জুলুম না করে।

এককথায় আমি যেন জালেমও না হই, মজলুমও না হই!

চার. মূর্খ সুলভ কোনো আচরণ যেন আমি না করি, আমার সঙ্গেও করা না হয়।

আমার সকল কথা ও কাজ যেন সুন্দর ও মার্জিত হয়। অসুন্দর কোনো কথা বা কাজ যেন কারো সাথে আমার না হয়। তেমনি আমার সাথেও কেউ কোনো অসুন্দর ও মন্দ আচরণ না করে।

এবার চিন্তা করুনÑ খুশূর সঙ্গে বের হওয়া আর উদাসীনতার সঙ্গে বের হওয়াÑ এই দুইয়ের মাঝে কত ফারাক!

এজন্য বললাম, দ্বীন-দুনিয়ার সকল কাজে খুশূ হাসিলের বিষয় আছে, যদি আমি সচেতন থাকি। তবে খুশূ-এর সবচেয়ে বড় ক্ষেত্র হল ইবাদত। ইবাদতের মধ্যেও নামায, তিলাওয়াত, যিকির ও দুআ-মুনাজাতÑ এগুলো হল খুশূর সবচে গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র। এসব আমলে খুশূ হাসিল করতে পারলে, এর বরকতে যিন্দেগীর অন্যান্য ক্ষেত্রেও খুশূ হাসিল হওয়া সহজ হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ।

যিকির, তিলাওয়াত ও দুআ-মুনাজাতে খুশূ হাসিলের উপায় সম্পর্কে গত মজলিসগুলোতে কিছু আলোচনা হয়েছিল। আজ নামাযের খুশূ সম্পর্কে কিছু বলার চেষ্টা করা হবে ইনশাআল্লাহ।

নামাযের খুশূ বিষয়ে কয়েকটি হাদীস

প্রথমে এই বিষয়ে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কয়েকটি হাদীস আমরা আলোচনা করব। আল্লাহ তাআলা বোঝার ও আমল করার তাওফীক দান করুন।

তাহিয়্যাতুল ওযুর বিষয়ে তিন সাহাবী থেকে তিনটি হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

তিনজন সাহাবী নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট তাহিয়্যাতুল ওযুর হাদীস শুনেছেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই আমলটির ফযীলত তিন সাহাবীকে তিন ভাষায় বর্ণনা করেছেন। ফযীলতটা সবাইকে হুবহু একই ভাষায় বলেছেনÑ তা কিন্তু নয়। এতে আমাদের ফায়দা বেশি হয়েছে। এই ভিন্ন ভিন্নভাবে বলাতে নামাযের খুশূ কীভাবে হয়, সে সম্পর্কেও আমরা হাদীসগুলোতে কিছু নির্দেশনা পেয়ে যাচ্ছি।

প্রথম হাদীস

এই হাদীস বর্ণিত হয়েছে উকবা ইবনে আমের রা. থেকে; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনÑ

مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَتَوَضَّأُ فَيُحْسِنُ وُضُوءَه، ثُمَّ يَقُومُ فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ، مُقْبِلٌ عَلَيْهِمَا بِقَلْبِه ِ وَوَجْهِه ِ، إِلّا وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ.

কোনো মুসলিম যখন উত্তমরূপে ওযু করে অতঃপর দুই রাকাত নামায এমনভাবে আদায় করে যে, তার চেহারা ও অন্তর তথা দেহ-মন পূর্ণ আল্লাহ-অভিমুখী থাকে, তার জন্য জান্নাত ওয়াজিব হয়ে যায়। Ñসহীহ মুসলিম, হাদীস ২৩৪

হাদীসে বলা হয়েছেÑ 'কোনো মুসলিম যদি ওযু করে এবং সুন্দরভাবে ওযু করে'। সুন্দরভাবে ওযু করার অর্থ সুন্নত মোতাবেক ওযু করা। যেমন ওযুর শুরুতে পবিত্রতার নিয়ত করা, বিসমিল্লাহ বলা, মিসওয়াক করা ইত্যাদি।

এই যে পবিত্রতার নিয়তের কথা বলা হল, শরীয়তের দৃষ্টিতে পবিত্রতা কিন্তু অনেক ব্যাপক। পবিত্রতার বিভিন্ন ধরন আছে। একটা তো হল যাহেরী পবিত্রতা। এটা ছাড়া পবিত্রতার আরো বিভিন্ন প্রকার রয়েছে। যেমন আকীদা-বিশ্বাসের পবিত্রতা, আমলের পবিত্রতা, চিন্তা-চেতনার পবিত্রতা, আখলাক-চরিত্র ও সীরতের পবিত্রতা এবং সর্বোপরি গোনাহ থেকে পবিত্রতা। ওযুর মাধ্যমে আমি এই সব ধরনের পবিত্রতার নিয়ত করতে পারি। আমি যেন এই ওযুর মাধ্যমে যাবতীয় গোনাহ থেকে পবিত্র হয়ে যেতে পারি! ওযু সংশ্লিষ্ট যত দুআ হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে, তাতেও এ বিষয়টার প্রতি ইঙ্গিত আছে। একটি দুআ এইÑ

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنِي مِنَ التَّوَّابِينَ، وَاجْعَلْنِي مِنَ الْمُتَطَهِّرِينَ.

(হে আল্লাহ! আমাকে বেশি বেশি তওবাকারী এবং অধিক পবিত্রতা রক্ষাকারীদের অন্তর্ভুক্ত করে নিন। Ñজামে তিরিমিযী, হাদীস ৫৫)

এই বর্ণনা থেকেও ওযুতে তওবার বিষয়টা পাওয়া যায়। আর ওযুর মাধ্যমে যে সগীরা গোনাহ মাফ হয়, সেটি তো অনেক সহীহ হাদীসে আছে। তো

সগীরা গোনাহ মাফ হওয়ার পাশাপাশি আমি যদি খালেস দিলে তওবাও করে ফেলি, তাহলে তো কবীরা গোনাহগুলোও মাফ হবে। কারো হক নষ্ট করা হলে, এই ওযুর সময়ই যদি আমি আল্লাহর কাছে অঙ্গীকার করে ফেলি যে, 'আল্লাহ! আমি তার হকগুলো আদায় করে দেব। আমি নিয়ত করলাম, আপনি আমাকে তাওফীক দান করুন!' তাহলে আল্লাহ যেমন ক্ষমা করে দেবেন, তেমনি হক আদায় করার রাস্তাও বের করে দেবেন ইনশাআল্লাহ!

ওযুর মাঝে এই দুআ পড়ার কথাও হাদীসে বর্ণিত হয়েছে-

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِي ذَنْبِي، وَوَسِّعْ لِيْ فِيْ دَارِيْ، وَبَارِكْ لِيْ فِيْ رِزْقِيْ.

হে আল্লাহ! আমার গোনাহ ক্ষমা করে দিন। আমার আবাসকে প্রশস্ত করুন এবং আমার রিযিকে বরকত দান করুন। Ñমুসনাদে আবু ইয়ালা, হাদীস ৭২৭৩; আমালুল ইয়াওমি ওয়াল লাইলাহ, নাসায়ী, হাদীস ৮০; আমালুল ইয়াওমি ওয়াল লাইলাহ, ইবনুস সুন্নী, হাদীস ২৮

এখানেও ইস্তিগফারের প্রসঙ্গ আছে। এজন্য ওযুকে ব্যাপকার্থে পবিত্রতা বানানো অনেক সহজ। সুতরাং খেয়াল করে নিয়তটাকে ব্যাপক করার চেষ্টা করতে হবে।

যাহোক হাদীসে প্রথমে সুন্দর করে ও সুন্নতসম্মতভাবে ওযু করার কথা বলা হয়েছে।

এরপর বলা হয়েছেÑ

ثُمَّ يَقُومُ فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ.

'তারপর দাঁড়িয়ে দুই রাকাত নামায আদায় করে।'

مُقْبِلٌ عَلَيْهِمَا بِقَلْبِه ِ وَوَجْهِه ِ.

অর্থাৎ এমনভাবে নামায পড়ে যে, ওই নামাযের মধ্যে তার পুরো দিল-মন আটকানো। ডানে-বামে কোনো দিকে তাকাচ্ছে না, মনটাও এদিক-সেদিক ছোটাছুটি করছে না; বরং দিল পরিপূর্ণ নামাযের দিকে ফেরানো। দৃষ্টিও সিজদার জায়গায় অবনত।

এখান থেকে নামাযের খুশূ-এর একটা স্তর আমরা পেয়ে যাই। এ স্তরটি অন্যান্য স্তরের তুলনায় তুলনামূলক সহজ। অর্থাৎ কেবল নামাযের দিকেই

দিলের খেয়াল থাকা। তাকবীরে তাহরীমা থেকে শুরু করে সানা, আউযুবিল্লাহ-বিসমিল্লাহ, সূরা ফাতেহাÑ যা পড়ছি, যেন খেয়াল করে পড়া হয়। সূরা ফাতেহা পড়ছিÑ একথা যেমন খেয়ালে থাকবে, তেমনি সূরা ফাতেহায় আমি কী বলছি, কী পড়ছিÑ সেটাও যেহেনে হাযির রাখবে। ইমামের পেছনে নামায পড়া অবস্থায় তো সূরা ফাতেহা ও পরবর্তী সূরা মেলানোর সময় চুপ থাকতে হয়। এই খামুশির সময়ও আমাকে নামাযের দিকেই মন রাখতে হবে। ভাবতে হবে, আমি আল্লাহর দরবারে দাঁড়িয়ে আছি। এখন আল্লাহর দরবারে রুকুতে যাচ্ছি। আর রুকু-সিজদাতে তো এমনিতেই তাসবীহ পাঠ করার আমল আছে।

মোটকথা, তাকবীরে তাহরীমা থেকে সালাম পর্যন্ত নামায নিয়ে ব্যস্ত থাকব। হাদীসের শাব্দিক অর্থ হল, তার চেহারাটাও নামাযের দিকে, তার দিলটাও নামাযের দিকে। মুখে যা পড়ছে, সব বুঝেশুনে পড়ছে। যা উচ্চারণ করছে, বুঝেশুনে উচ্চারণ করছে। এমন হয় না যে, আত্তাহিয়্যাতু পড়ার সময় খবরই নেই, মুখে আত্তাহিয়্যাতু পড়ল, নাকি অন্যকিছু পড়ল! অর্থ বুঝুক আর না বুঝুক, যা পড়ছে, শব্দে শব্দে খেয়াল করে পড়বে। আর যদি অর্থ-মর্ম খেয়াল করে পড়ে, তাহলে তো কথাই নেই! খুশূ হয়েই গেল।

তাহলে তাহিয়্যাতুল ওযুর হাদীসে আমরা সকল নামাযের খুশূর সবক পেয়ে গেলাম। আমি নামায এমনভাবে পড়ব, যেন চেহারা ও দৃষ্টির সঙ্গে আমার মনটাও আল্লাহ-অভিমুখী থাকে। দিলের মধ্যে যেন এই খেয়াল থাকে যে, আমি এখন সূরা ফাতেহা পড়ছি, এখন আমি রুকুতে আছি, এখন সিজদাতে, এখন আত্তাহিয়্যাতু পড়ছি, এখন দরূদ শরীফ পড়ছি। একটা আমলও যেন আমার বে-খেয়ালিতে পার না হয়ে যায়। বেখেয়ালিতে যেন কোনো কিছু উচ্চারণ না হয়।

এই অনুশীলন যদি করতে পারি, ধীরে ধীরে অন্যগুলোও আসতে থাকবে ইনশাআল্লাহ। খুশূর আরো গভীর দিক যেগুলো, সেগুলোর তুলনায় এই অনুশীলন সহজ।

এজন্য হযরত হাকীমুল উম্মত আশরাফ আলী থানভী রাহ. এখান থেকে খুশূর সবক শুরু করিয়েছেন। তিনি বলেছেন, এমন পাকা হাফেযের মতো পড়বে

না যে, তার দিল যেখানেই থাকুক; মুখ চলতে থাকে; কোনো ভুল হয় না। বরং যে হাফেযের মনোযোগ না দিলেই লোকমার প্রয়োজন হয়, তার মতো খেয়াল করে করে পড়বে।

হাদীসের শেষাংশÑ

إِلَّا وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ.

তার জন্য জান্নাত ওয়াজিব বা অবধারিত।

দ্বিতীয় হাদীস

দ্বিতীয় হাদীসটি তৃতীয় খলীফা উসমান রা. থেকে বর্ণিত। এটাও তাহিয়্যাতুল ওযু সম্পর্কে। হুমরান ইবনে আবান নামক একজন তাবেয়ী বলেনÑ ‘আমি উসমান রা.-কে ওযু করতে দেখলাম...’। এই বলে তিনি উসমান রা.-এর ওযুর বিবরণ দিলেন। তারপর তিনি উসমান রা.-এর বক্তব্য উদ্ধৃত করেছেন; উসমান রা. বলেছেনÑ

رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ نَحْوَ وَضُوئِي هذَا.

‘আমি নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এরকম ওযু করতে দেখেছি।’

ثُمَّ قَالَ: مَنْ تَوَضَّأَ وُضُوئِي هذَا، ثُمَّ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ لاَ يُحَدِّثُ نَفْسَهُ فِيهِمَا بِشَيْءٍ، إِلّا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ.

এরপর বলতে শুনেছি, আমি যেভাবে ওযু করেছি সেভাবে যে ওযু করবে, তারপর এমনভাবে দুই রাকাত নামায পড়বেÑ ওই সময় সে তার মনের সাথেও কোনো কথা বলবে নাÑ তার পেছনের সমস্ত গোনাহ ক্ষমা করে দেওয়া হবে। Ñসহীহ বুখারী, হাদীস ১৯৩৪; মুসনাদে আহমাদ, হাদীস ৪২১

এখানেÑ

فَيُحْسِنُ وُضُوءَهُ.

(উত্তমরূপে ওযু করবে)

Ñএ বাক্য বলা হয়নি; বরং বলা হয়েছে, আমি যেভাবে ওযু করেছি, সেভাবে। বলার অপেক্ষা রাখে না, নবীজীর ওযু সর্বোৎকৃষ্ট ওযু। এখন এই ওযুর যে যত কাছাকাছি আসতে পারে, তার ওযু তত উৎকৃষ্ট ও সুন্দর হবে। প্রত্যেক অঙ্গ তিনবার করে সুন্দরভাবে ধোয়াÑ এটি সবাই পেরে যাব ইনশাআল্লাহ। সাথে অনুভূতি ও নিয়তের ক্ষেত্রে যে যতটুকু গভীরে অগ্রসর হতে পারে।

যাইহোক, এই হাদীসে খুশূর বিষয়ে বলা হয়েছেÑ

ثُمَّ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ لاَ يُحَدِّثُ نَفْسَهُ فِيهِمَا بِشَيْءٍ.

এমনভাবে দুই রাকাত নামায পড়বে যে, সে তার মনের সাথেও কোনো কথা বলবে না।

নামাযে কি কেউ অন্য কারো সাথে কথা বলে? বলে না; বরং যা হয় সব তো নিজের মনের সঙ্গেই হয়। এখানে বলা হয়েছে, দুই রাকাত নামায এমনভাবে পড়বে যে, মনের সাথেও কথা বলবে না। অর্থাৎ এদিক-সেদিকের সব চিন্তা বাদ দিয়ে একেবারে নামাযেই সমাহিত হওয়া এবং ডুবে যাওয়া।

আগের হাদীসে খুশূর যে স্তরের কথা বলা হয়েছে, তার চেয়ে এটি আরো ওপরের। যদিও ওই হাদীসের মর্মের মধ্যেও এই স্তরটি রয়েছে, কিন্তু সে হাদীসের পাঠ থেকে প্রথম স্তরটির কথাই আগে বুঝে আসে। আর তাতে আমাদের জন্য একটি সহজ রাস্তা খুলল। সুতরাং আগের হাদীসের বার্তা অনুযায়ী আমরা মেহনত শুরু করে পৌঁছুতে পৌঁছুতে এখানে এসে উপনীত হতে পারি! এভাবে যদি কেউ দুই রাকাত নামায পড়তে পারে, তাহলে তার পেছনের সকল গোনাহ ক্ষমা করে দেওয়া হবে।

তৃতীয় হাদীস

তৃতীয় হাদীসটি সাহাবী আমর ইবনে আবাসা রা. বর্ণনা করেছেন। সহীহ মুসলিম (হাদীস ৮৩২), মুসনাদে আহমাদ (হাদীস ১৭০১৯)-সহ হাদীসের বিভিন্ন কিতাবে এটি বর্ণিত হয়েছে। লম্বা হাদীস। সেখানে তিনি নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে ওযুর সওয়াব ও ফযীলতের কথা বর্ণনা করেছেন, তারপর তাহিয়্যাতুল ওযুর নামাযের সওয়াবও বর্ণনা করেছেন। তখন উপস্থিত একজন তাঁকে সতর্ক করার জন্য বলে উঠলেন, আপনি কী বলছেন খেয়াল করে বলুন! আপনি কি এটা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে শুনেছেন? এত এত সওয়াব দেওয়া হবে কেবল একটা আমলের জন্য?! তখন তিনি বললেনÑ

يَا أَبَا أُمَامَةَ، لَقَدْ كَبِرَتْ سِنِّي، وَرَقَّ عَظْمِيْ، وَاقْتَرَبَ أَجَلِيْ، وَمَا بِيْ حَاجَةٌ أَنْ أَكْذِبَ عَلَى اللهِ وَلَا عَلى رَسُولِ اللهِ، لَوْ لَمْ أَسْمَعْهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلّا مَرَّةً، أَوْ مَرَّتَيْنِ، أَوْ ثَلَاثًا حَتّي عَدَّ سَبْعَ مَرَّاتٍ، مَا حَدَّثْتُ بِهِ أَبَدًا، وَلَكِنِّي سَمِعْتُه أَكْثَرَ مِنْ ذٰلِكَ.

‘দেখ, আমি বুড়ো ও দুর্বল হয়ে গিয়েছি। মৃত্যু ঘনিয়ে এসেছে। আল্লাহ ও রাসূলুল্লার বিষয়ে মিথ্যা বলার আমার কী প্রয়োজন? আমি যদি এটি রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে একবার, দুইবার, তিনবার, চারবার, পাঁচবার, ছয়বার, সাতবার না শুনতাম, তাহলে বলতাম না। কিন্তু এটি আমি তাঁর থেকে এর চেয়েও বেশিবার শুনেছি’

সেই হাদীসে ওযুর বিবরণ এবং ওযুর সওয়াব বর্ণনা করার পর নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনÑ

فَإِنْ هُوَ قَامَ فَصَلّى، فَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ وَمَجَّدَهُ بِالَّذِي هُوَ لَهُ أَهْلٌ، وَفَرَّغَ قَلْبَهُ لِلهِ.

‘ওযু শেষ করে যদি সে নামাযে দাঁড়ায় তারপর আল্লাহর শান মোতাবেক তাঁর হামদ ও প্রশংসা করে, তাঁর বড়ত্ব ও মর্যাদা বর্ণনা করতে থাকে এবং তার দিলটাকে আল্লাহর জন্য ফারেগ করে দেয়।’

খেয়াল করুন, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনÑ

وَفَرَّغَ قَلْبَهُ لِلهِ.

এটা খুশূ-এর একেবারে ওপরের একটা স্তর। অর্থাৎ তার দিলে আল্লাহর যিকির ও স্মরণ ছাড়া আর কিছুই নেই।
তাহলে কী সওয়াব হবে? শুনুনÑ

إِلّا انْصَرَفَ مِنْ خَطِيئَتِهِ كَهَيْئَتِهِ يَوْمَ وَلَدَتْهُ أُمُّه ۟.

‘তার মা যেদিন তাকে জন্ম দিয়েছে, সেদিন সে যেমন একেবারে নিষ্পাপ ও নিষ্কলুষ ছিল, ওইভাবে নামাযের পরেও সে ঠিক এরকমই পবিত্র হয়ে যাবে।’
এখন আপনি যদি তাহিয়্যাতুল ওযুর পুরো নামাযে এই হালত ধরে রাখার উদ্দেশ্যে, নামাযের ওয়াজিব, সুন্নত ও মুস্তাহাবসমূহ ঠিক ঠিকভাবে আদায় করার পাশাপাশি নামায সংক্ষিপ্ত করেন, তাহলে এতে আপত্তির কিছু নেই।
যাহোক এখন আমাদের এ হাদীসগুলো পড়ার মূল উদ্দেশ্য হল, এ হাদীসগুলো থেকে খুশূ-খুযূর সবক হাসিল করা। তবে প্রসঙ্গক্রমে আমরা ওযুর ফযীলত, তাহিয়্যাতুল ওযু বা ওযু-পরবর্তী নামাযের ফযীলত এবং খুশূ-খুযূর ফযীলতও জানতে পারলাম। আল্লাহ তাআলা আমাদের তাওফীক দান করুন।
তিন হাদীসের তিনটা কথাই কাছাকাছি। দিলটা নামাযের দিকে থাকবে। নামাযে অন্য চিন্তা-ভাবনা করবে না। মূলত নামাযে আওয়াজবিহীন কথা চলতেই থাকে। নামায কথার জায়গা, কিন্তু তা আল্লাহর সঙ্গে। আমাদের হালত হল আল্লাহর সঙ্গে কথা চলতে থাকে বেখবর ও গাফলতের হালতে আর সঙ্গে অন্য কথাও চলে...!
নামায আল্লাহর সঙ্গে কথা বলার জন্য, তাই নামাযে দিল-দেমাগ ও মন-মস্তিষ্ককে আল্লাহর জন্য ফারেগ করে দিতে হবে! এর জন্য অনুশীলন করতে হবে। আর অনুশীলন ও চর্চা করতে গেলে কিছু সহযোগী মাধ্যমেরও প্রয়োজন হয়।

নামাযে খুশূ হাসিলের সহায়ক তিনটি বিষয়

নামাযে খুশূ হাসিলের সহায়ক তিনটি বিষয়ে আলোচনা করা যাক।

১.

প্রথম সহায়ক বিষয় হল, যা তাকী ছাহেব হুজুর বলে থাকেন। তিনি তাঁর ভাষায় বলেন, আমি সংক্ষেপে বলছি।

আসলে আমরা চাই কীÑ আমাদের ভাব দেখে মনে হয়, আমরা চাইÑ নামাযের আগে-পরের সবকিছু থাকবে খুশূমুক্ত আর শুধু নামায হয়ে যাবে খুশূওয়ালা! এটা আসলে একটু কঠিনই বটে। নামাযকে খুশূযুক্ত করতে হলে নামাযের আগে-পরের সবকিছুকেই খুশূমুখী করার চেষ্টা করতে হবে। বরং ওযু থেকে যদি আমার খুশূ শুরু হয়, ঘর থেকে মসজিদে আসা যদি খুশূর সাথে হয়, তাহলে নামাযের খুশূ সহজ হবে।

মসজিদে এসে তাহিয়্যাতুল মসজিদ পড়লাম, তারপর সুন্নত পড়লাম, তারপর ফরয শুরু করলামÑ এভাবে ধাপে ধাপে অগ্রসর হলে মূল ফরয নামাযের মধ্যে খুশূটা অনেক সহজ হয়ে যাবে, ইনশাআল্লাহ। কাজেই নামাযের খুশূর জন্য নামাযের আগে-পরের যিন্দেগীকে খুশূমুখী করার চেষ্টা করা।

অনেকের অবস্থা হলÑ নামাযের সালাম ফেরাতে না ফেরাতে বের হওয়ার জন্য ব্যস্তসমস্ত হয়ে পড়ে। হাঁ, কারো বিশেষ প্রয়োজন হলে তো বের হবেই; তবে বেশি ঠ্যাকা না হলে কিছুক্ষণ বসে থাকার মধ্যেই ফায়েদা। এক ফায়েদা তো মসজিদে বসে থাকার ফায়েদা। দ্বিতীয় ফায়েদা হল, ফেরেশতারা এই ব্যক্তির জন্য দুআ করতে থাকেÑ

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لَه، اَللّٰهُمَّ ارْحَمْه.

আল্লাহ, তাকে ক্ষমা করুন, তার প্রতি দয়া করুন!

ফেরেশতার দুআ পাওয়া কি কোনো মামুলি কথা!

তৃতীয় আরেক ফায়দা হল, মানুষ কোনো প্রয়োজনে কারো কাছে গেলে বা কোনো অফিস-আদালতে গেলে প্রয়োজন শেষ হওয়ার পর ফিরে আসে। তো

মসজিদে এসেছি কিছু আশা নিয়ে। আল্লাহর নৈকট্য অর্জনের আশা। কুরআনে বলা হয়েছেÑ

وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ.

সিজদা কর আর আল্লাহর নিকটে পৌঁছে যাও!

বোঝা গেল সিজদা ও নামাযের মাধ্যমে আল্লাহর নৈকট্য অর্জন হয়। আল্লাহর রহমত ও মাগফিরাতের আশা নিয়ে আমি সিজদা করব। আমার জাগতিক, পারিবারিক বা ব্যক্তিগত যত সমস্যা, আমার বা দেশের কিংবা পুরো উম্মত ও মুসলিম বিশ্বের যত সমস্যা, সব সমস্যার সমাধান আল্লাহ তাআলা নামাযের মাধ্যমে করে দিতে পারেন। কারণ বলা হয়েছেÑ

يَآيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اسْتَعِيْنُوْا بِالصَّبْرِ وَ الصَّلٰوةِ.

তোমরা সবর ও নামাযের মাধ্যমে আল্লাহর সাহায্য কামনা কর। Ñসূরা বাকারা (২) : ১৫৩

নামায বলতে কেবল নফল নামায নয়; বরং ফরয নামাযের মাধ্যমেও আল্লাহর সাহায্য প্রার্থনা করা যায়। আমার সকল সমস্যার সমাধান আল্লাহ তাআলা করে দেবেনÑ এ আশা নিয়ে মসজিদে এসেছি; কিন্তু তাড়াহুড়ো করে মসজিদ থেকে বের হয়ে যাওয়া মানে, কেমন যেন আমার সকল মাকসাদ হাসিল হয়ে গেছে। আমার যা দরকার সব পেয়ে গিয়েছি। অথচ ভাবটা থাকা দরকার ছিল এমন, যে উদ্দেশ্যে আমার আসা, সব কি আমার হাসিল হয়েছে? হাসিল করতে পেরেছি? আচ্ছা, আরেকটু বসে থাকি! যাদের হয়তো হাসিল হয়েছে, তারা চলে যাচ্ছে, আমারও কি হাসিল হয়ে গিয়েছে? এভাবে একটা অনুভূতি নিয়ে কিছুক্ষণ মসজিদে দেরি করতে পারি।

এটা মাসআলা বলছি না। মাসআলা তো আগেই বললাম যে, কারো প্রয়োজন থাকলে বের হতে পারে আর বসে থাকলে ফেরেশতার দুআ পাবে

মসজিদ থেকে বের হওয়ার তরীকা

আচ্ছা, মসজিদ থেকে পাঁচ মিনিট আগে বের হই আর পরে; বের হওয়ার তরীকা কী হবে? মসজিদ থেকে বের হওয়ার সুন্নত আপনি যদি পাঁচটা বলেন, আমি ছয় নম্বরটা বলব। সেটি হল, মসজিদ থেকে এমন হালতে বের হব, যেন দিলটা মসজিদের সঙ্গে লেগে থাকে। হাদীসের ভাষায়Ñ

قَلْبُه مُعَلَّقٌ بِالْمَسْجِدِ.

(দিলটা মসজিদের সঙ্গে লেগে থাকে)

মসজিদ থেকে বের তো হতেই হবে। দ্বীন-দুনিয়ার কত যিম্মাদারি আল্লাহ তাআলা মানুষকে দিয়েছেন! কেউ সারাদিন মসজিদে বসে থাকবে, এটা হয় না! আল্লাহ এটা চানও না! সূরা জুমুআতে আল্লাহ তাআলা প্রথমে বলেছেন, যখন আযান হয়, সমস্ত বেচাকেনা কাজ-কারবার বন্ধ করে মসজিদে চলে আসো! তারপর বলেছেন, নামায শেষ হয়ে গেলেÑ

فَانْتَشِرُوْا فِى الْاَرْضِ وَ ابْتَغُوْا مِنْ فَضْلِ اللهِ.

আল্লাহর জমিনে ছড়িয়ে পড় এবং আল্লাহর 'ফযল' তালাশ কর। কিন্তু তখনো আল্লাহকে ভুলো নাÑ

وَ اذْكُرُوا اللهَ كَثِيْرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ.

এবং আল্লাহকে স্মরণ কর বেশি বেশি; যাতে তোমরা সফলকাম হও।

যাইহোক, আল্লাহ আমাদের বলছেন, নামায শেষ করে মসজিদ থেকে বের হয়ে কাজে যাও, কিন্তু সেই যাওয়াটা কী হালতে হবে? হাদীসের ভাষ্য হলÑ

قَلْبُه ◌ٌ مُعَلَّقٌ بِالْمَسْجِدِ.

তার দিলটা মসজিদের সঙ্গে লেগে থাকবে; অস্থির থাকবেÑ আবার কখন ফিরে আসব!

তো নামাযের পরের হালত হবে, আমি মসজিদে যে আশা ও অনুভূতি নিয়ে এসেছি, সেটি পূর্ণ হয়েছে কি নাÑ মনে এ ভয় থাকা এবং বের হওয়ার সময় দিলটা মসজিদের সঙ্গে লেগে থাকা। সাথে বের হওয়ার দুআ পড়াÑ

اَللّٰهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ.

অর্থাৎ হে আল্লাহ! আমি আপনার ফযল ও রিযিক চাই।

রিযিক অনেক ব্যাপক বিষয়। পানাহার যেমন রিযিক, সুস্থতাও রিযিক। দ্বীন-দুনিয়ার সকল খায়ের ও কল্যাণও রিযিক। একজন ছাত্রের মেধা দরকার। একজন তালিবুল ইলমের ইলম ও আমল দরকার। এ সবকিছু 'রিযক'-এর অন্তর্ভুক্ত। সবকিছু আল্লাহর নিকট চেয়েই আমি তাঁর ঘর থেকে বের হচ্ছি। সাথে আমার দিলটাও মসজিদের সঙ্গে আটকানো। যোহর পড়ে বের হয়েছি তো আসরের জন্য মনটা ব্যাকুল। আসর পড়ে বের হয়েছি তো মাগরিবের জন্য মন ব্যাকুল। বা অন্য কোনো উপলক্ষে বা উপলক্ষ ছাড়াও মসজিদে চলে আসা।

এভাবে নামাযের আগে-পরের অবস্থাকে যদি আমি খুশূমুখী করতে পারি, তবে নামাযের খুশূ সহজ হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ।

২.

দ্বিতীয় উপায় হল ইহসান-এর অনুশীলন। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনÑ

أَنْ تَعْبُدَ اللهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ.

(তুমি আল্লাহর ইবাদত এমনভাবে করবে, যেন তুমি তাঁকে দেখছ। যদি তুমি তাঁকে নাও দেখ, তবে তিনি তো তোমাকে অবশ্যই দেখছেন। Ñসহীহ মুসলিম, হাদীস ৮)

নামায শুরু করার আগেই চিন্তা করি যে, আমি তো আল্লাহর দরবারে এসেছি। আল্লাহ আমাকে দেখছেন। সুতরাং আমিও ইবাদতটা এমনভাবে করার চেষ্টা করি, যেন আমি আল্লাহকে দেখছি!

যদিও মূলত আমি দেখছি না বা দেখতে পারছি না, কারণ দুনিয়াতে আল্লাহকে কীভাবে দেখা যাবে; আর সে চোখও আমার নেই। কিন্তু আল্লাহর আজমত, মহত্ব ও বড়ত্ব এবং তাঁর গুণাবলি যেন আমার দিলে উপস্থিত থাকে, তাঁর রহমত ও কুদরতের কথা যেন স্মরণে থাকে, সর্বোপরি 'আল্লাহ হাযির-নাযির' এই চিন্তা যেন আমার মনে সদা জাগ্রত থাকে।

আল্লাহ আমাকে দেখছেন, কাজেই আমার ঠিকমতো আমলটা করা উচিতÑ এই অনুভূতি হল ইহসান-এর একটা স্তর।

ইহসানের যে শিক্ষা নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দিয়েছেন সেটি যে কোনো আমলের জন্যই প্রযোজ্য। বিশেষত নামাযের জন্য। নামায শুরু করার সময়, বরং নিয়ত করার আগে যখন ওযু করে মসজিদের দিকে আসছি, তখন থেকেই এটা চিন্তা করি যেÑ

أَنْ تَعْبُدَ اللهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ.

(তুমি আল্লাহর ইবাদত এমনভাবে করবে, যেন তুমি তাঁকে দেখছ। যদি তুমি তাঁকে নাও দেখ, তবে তিনি তো তোমাকে অবশ্যই দেখছেন।)

এর দ্বারা নামাযে দিল হাযির রাখার যে কথা বলা হয়েছে, তার প্রয়োগটা সহজ হবে ইনশাআল্লাহ।

৩.

তৃতীয় আরেকটি সূত্র নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অন্য হাদীসে বলেছেন, যা আমরা গত মজলিসের আগের মজলিসে আলোচনা করেছিÑ

صَلِّ صَلَاةَ مُوَدِّعٍ.

অর্থাৎ এমনভাবে নামায আদায় কর, যেন এটাই জীবনের শেষ নামায।

নিজের মধ্যে এই অনুভূতি জাগ্রত রাখার চেষ্টা করা চাই, আজই বুঝি আমার জীবনের শেষ নামায! জুমা পড়ে গেলাম, আসর পড়ার জন্য হয়তো আর আসার সুযোগ হবে না; বরং হয়তো এখানে আমার জানাযার জন্য লাশ আসতে পারে। আমার হয়তো নামাযের জন্য আর আসা হবে না! নামাযে দাঁড়ালেই নিজের ওপরে এই ভাবনাকে হাযির করা যে, এটাই আমার জীবনের শেষ নামায! কাজেই যত সুন্দর করে পড়তে পারি।

তথ্যসূত্র

১। মাসিক আল কাউসার

২। বইঃ নামাজ পড়ার গুরুত্ব

৩। অন্যান্য সোর্স থেকে